লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৫ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৬, চৈত্র ১৪০২

বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিবর্তন

মোহাম্মদ আলী *

১.০ ভূমিকা

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ১০ই এপ্রিল তারিখে জারীকৃত 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' দ্বারা সদ্য স্বাধীন দেশটির একটি সাংবিধানিক কাঠামো তৈরী হয়। ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারী অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করা হয়। উক্ত আদেশ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড পরিচালিত হতে থাকে। এর পাশাপাশি একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান প্রণয়নের কাজও শুরু করা হয়। ৪ঠা নভেম্বর তারিখে গণপরিষদে সংবিধান গৃহীত হয়, ১৬ই ডিসেম্বর তারিখ থেকে তা কার্যকর করা হয়। সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা ছিল এই সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এটি ছিল এদেশের জনগণের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নের রূপায়ন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পর্যায়ে সংবিধানের নানারূপ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ সময়ে সরকার পদ্ধতিতে যেমন পরিবর্তন হয়েছে, তেমনি সংবিধানের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যও পরিবর্তিত হয়েছে। অবশ্য গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সরকার-ব্যবস্থা আবার সংসদীয় পদ্ধতিতে স্থিত হয়েছে। এ প্রসংগে একটি বিষয় উল্লেখ্য, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রায়ই দেখা যায় অনেক গণতান্ত্রিক সরকার কালক্রমে কর্তৃত্বকামী সরকারে পরিণত হয়। এ ধরনের সরকার তাদের স্থায়িত্ব রক্ষার মানসে ক্রমশ সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করতে থাকে। এ থেকে স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়—গণতান্ত্রিক একটি কাঠামোর মধ্যে একটি দারিদ্র্য-জর্জর সমাজের স্থিতিশীলতা কতদূর নিশ্চিত করা যায়? পাশ্চাত্যে গণতন্ত্র যে অর্থে ব্যবহার করা হয়, অনগ্রসর একটি দেশে তা কতটা প্রাসঙ্গিক, তাও বিবেচনার বিষয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে দেখা গেছে একটি গণতান্ত্রিক সরকার একটি একদলীয় সরকারে পরিণত হয়েছে। এছাড়া দু'বার সংবিধান বহির্ভূত উপায়ে রাষ্ট্রক্ষমতার পরিবর্তন ঘটেছে। কোন্ আর্থ-সামাজিক অবস্থা অথবা রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনকে অপরিহার্য করে তুলেছিল-সে বিষয়ে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। এছাড়া অসাংবিধানিক উপায়ে সরকার পরিবর্তনের বিষয়টি অনিবার্য ছিল কিনা-সে বিষয়েও আকর্ষণীয় আলোচনা হতে পারে। তবে এ লেখার পরিসরে তা করা সম্ভব নয়; এ লেখার তা উদ্দেশ্যও নয়। এ লেখার উদ্দেশ্য হলো সংবিধান প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায় এবং সংবিধানে আনীত

---

* এস্টেট অফিসার, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

বিভিন্ন সংশোধনী সম্পর্কে আলোচনা করা। এর সাথে বিভিন্ন সময়ে সরকার ব্যবস্থায় কাঠামোগত যে পরিবর্তন হয়েছে তা পর্যালোচনা করা।

২.০ প্রাক–সংবিধান পর্ব

২.১ পূর্ণাঙ্গ সংবিধান প্রণয়নের পূর্বে দু'টো দলিল দ্বারা বাংলাদেশের সাংবিধানিক কাঠামো নির্ধারিত হয়েছিল। দলিল দু'টো হলো স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও অস্থায়ী সংবিধান আদেশ। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

ক. স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ঃ ১৯৭০–৭১ সালের নির্বাচনে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের পক্ষ থেকে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' জারি করা হয়। ১৭ই এপ্রিল নবগঠিত মন্ত্রিপরিষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে পঠিত এই ঘোষণাপত্রটি ২৬শে মার্চ ১৯৭১ থেকে কার্যকর করা হয়। এতে রাষ্ট্রের সকল নির্বাহী কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়। ঘোষণাপত্রে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ, রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হয় ঃ

"till such time as a constitution is framed, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman shall be the President of the Republic and Syed Nazrul Islam shall be the Vice-President of the Republic, and

the President shall be the Supreme Commander of all the Armed Forces of the Republic.

and shall exercise all the Executive and legislative powers of the Republic including the power to grant pardon.

shall have the power to appoint a Prime Minister and such other Ministers as he considers necessary.

shall have the power to levy taxes and expend moneys.

shall have the power to summon and adjourn the Constituent Assembly.

and do all other things that may be necessary to give to the people of Bangladesh an orderly and just Government.

উক্ত ঘোষণাপত্রে রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে উপ–রাষ্ট্রপতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বলে উল্লেখ করা হয়।

খ. সাময়িক সংবিধান আদেশ ঃ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারী সাময়িক সংবিধান আদেশ জারী করেন। এই আদেশের মাধ্যমে সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। সাময়িক সংবিধান আদেশের ৫ এবং ৬ নং ধারায় বলা হয় ঃ

"5. There shall be a Cabinet of Ministers with the Prime Minister at the head.

6. The President shall in exercise of all his functions act in accordance with the advice of the Prime Minister."

২.২ সাময়িক সংবিধান আদেশকে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশের মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে আরো একটি আদেশের বিষয় এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সেটি হলো আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশ (The laws continuance enforcement order)। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে জারীকৃত এই আদেশে পাকিস্তান আমল থেকে চলমান সকল আইন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের অনুমোদনসাপেক্ষে বৈধকরণ ও কার্যকর করা হয়। এতে আরো বলা হয় যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যেসব আইন সামঞ্জস্যবিহীন বলে গণ্য হবে সে সমস্ত আইন কার্যকর করা যাবে না। কোন প্রকার আইনগত শূন্যতা পরিহার করার লক্ষ্যে এই আদেশটি ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখ থেকে কার্যকর করা হয়।

৩.০ সংবিধান প্রণয়ন

৩.১ বাংলাদেশের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ তারিখে 'বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ' জারি করা হয়। উক্ত আদেশ দ্বারা ১৯৭০-৭১ সালের নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিয়ে গণপরিষদ গঠন করা হয়। গণপরিষদকে সংবিধান প্রণয়ন ছাড়া অন্যকোন দায়িত্ব দেয়া হয়নি। সম্ভবত পাকিস্তান আমলের তিক্ত অভিজ্ঞতার বিষয় স্মরণ রেখেই এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। পাকিস্তান আমলে প্রথম গণপরিষদকে সংবিধান প্রণয়নের পাশাপাশি আইন প্রণয়নেরও দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। এর ফলাফল শুভ হয়নি। উক্ত গণপরিষদ দীর্ঘ সময়ের পরও একটি সংবিধান প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হয়। অধিকন্তু আইন পরিষদ হিসেবে কাজ করতে গিয়ে রাজনৈতিক কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে। পরিণামে গণপরিষদের অপমৃত্যু ঘটে।

৩.২ যাই হোক, সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে গণপরিষদ ১৯৭২ সালের ১০ই এপ্রিল বৈঠকে মিলিত হয়। দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে খসড়া সংবিধান প্রণয়নের জন্য আইনমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যগণ হলেন ঃ

১। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ২। তাজউদ্দিন আহমদ, ৩। খন্দকার মুশতাক আহমেদ, ৪। এ এইচ এম কামরুজ্জামান, ৫। এম আব্দুর রহিম, ৬। আব্দুর রউফ, ৭। মোঃ লুৎফর রহমান, ৮। আব্দুল মমিন তালুকদার, ৯। অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, ১০। মোঃ বায়তুল্লাহ, ১১। আমিরুল ইসলাম, ১২। বাদল রশীদ বার এট ল', ১৩। খন্দকার আব্দুল হাফিজ, ১৪। মোঃ নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, ১৫। শওকত আলী খান, ১৬। মোঃ হুমায়ুন খালিদ, ১৭। আছাদুজ্জামান খান, ১৮। এ কে মোশাররফ হোসেন আখন্দ, ১৯। আব্দুল মমিন, ২০। শামসুদ্দিন মোল্লা, ২১। শেখ আব্দুর রহমান, ২২। ফকির সাহাব উদ্দিন আহমদ, ২৩। আব্দুল মুনতাকীম চৌধুরী, ২৪। অধ্যাপক খুরশেদ আলম, ২৫। সিরাজুল হক, এ্যাডভোকেট, ২৬। দেওয়ান আবুল আব্বাছ, ২৭। হাফিজ হাবিবুর

রহমান, ২৮। মোঃ আব্দুর রশীদ, ২৯। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, ৩০। নুরুল ইসলাম চৌধুরী, ৩১। মুহাম্মদ খালেদ, ৩২। বেগম রাজিয়া বানু ,ও ৩৩। ডাঃ ক্ষিতীশ চন্দ্র মন্ডল

৩.৩ ১৯৭২ সলের ১৭ই এপ্রিল সংবিধান-প্রণয়ন কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে কমিটির কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে জনসাধারণকে কমিটির কাছে প্রস্তাব ও পরামর্শ পাঠানোর অনুরোধ করা হয়। এর ফলে ৯৮ টি স্মারকলিপি পাওয়া যায়। সাইক্লোস্টাইল পদ্ধতিতে সেগুলো মুদ্রিত করে কমিটির সদস্যদের কাছে বিলি করা হয়। সদস্যগণ সেসব পরামর্শ বিবেচনা করেন।

৩.৪ ১৭ই এপ্রিল থেকে ২৯শে এপ্রিল পর্যন্ত কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কয়েক দিনের জন্য মুলতবির পর ১০ই মে থেকে ২৫শে মে পর্যন্ত আবার একাধিক্রমে বৈঠক চলতে থাকে। এসব বৈঠকে প্রতিটি বিধান নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয় এবং আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করা হয়। ফলে বেশিরভাগ অনুচ্ছেদ ও দফা সম্পর্কে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩.৫ ২৫শে মে তারিখে কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, খসড়া বিধানাবলী নিয়ে সদস্যগণ যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তার ভিত্তিতে সংবিধানের একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া প্রস্তুত করা হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া প্রণয়ন করা হয় এবং ৩রা জুন তারিখে কমিটির বৈঠক আবার শুরু হলে খসড়াটি উপস্থাপন করা হয়। কমিটি এই খসড়াটি দফাওয়ারী আলোচনা করেন এবং বেশ কিছু সংশোধনীসহ ১০ই জুন তারিখে খসড়াটি অনুমোদন করেন।

৩.৬ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খসড়া সংবিধানটি আইনগত খসড়া-রচনাকারীদের (টেকনিক্যাল ড্রাফট্স্ম্যান) দ্বারা পরীক্ষিত হয়। এছাড়া সংবিধানের ভাষাগত উন্নতি সাধনের জন্য জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ডঃ মাযহারুল ইসলাম এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ আনিসুজ্জামানকে নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি খসড়া পরীক্ষা করেন। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী খসড়া সংবিধানের ভাষাগত পরিমার্জন করা হয়।

৩.৭ অতঃপর ১৯৭২ সালের ১৮ই অক্টোবর ৬জন সদস্যের মতানৈক্যমূলক বক্তব্যসহ খসড়া সংবিধান বিল আকারে গণপরিষদে উপস্থাপন করা হয়। এই ৬ জন সদস্য হলেনঃ

১। আছাদুজ্জামান খান, ২। এ,কে,এম, মোশাররফ হোসেন আখন্দ, ৩। আব্দুল মুন্তাকিম চৌধুরী, ৪। হাফিজ হাবিবুর রহমান, ৫। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, ৬। ডাঃ ক্ষিতিশ চন্দ্র মন্ডল।

৩.৮ দীর্ঘ আলোচনার পর গণপরিষদে ৪ঠা নভেম্বর সংবিধান গৃহীত হয়। ১৪ই ডিসেম্বর হস্তলিখিত সংবিধানে স্বাক্ষরদানের জন্য গণপরিষদ সদস্যগণ পুনরায় মিলিত হন। ঐদিন গণপরিষদের স্পীকর জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ সংবিধানের মূল বাংলা লিপি এবং এর ইংরেজি লিপিতে স্বাক্ষর দিয়ে সংবিধানকে প্রমাণীকৃত করেন। এভাবে বিধিবদ্ধ সংবিধান পরবর্তী বিজয় দিবস অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসিম্বর থেকে কার্যকর হয়।

৪.০ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

৪.১ একটি প্রস্তাবনা, চারটি তফশীল ও ১৫৩টি অনুচ্ছেদ নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়। ১৫৩টি অনুচ্ছেদ আবার ১১ভাগে বিভক্ত হয়। ভাগগুলো হলো ঃ

ভাগ	বিষয়	অনুচ্ছেদ
১ম	প্রজাতন্ত্র	১-৭
২য়	রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি	৮-৫
৩য়	মৌলিক অধিকার	২৬-৪৭
৪র্থ	নির্বাহী বিভাগ	৪৮-৬৪
৫ম	আইন সভা	৬৫-৯৩
৬ষ্ঠ	বিচার বিভাগ	৯৪-৯৭
৭ম	নির্বাচন	১১৮-১২৬
৮ম	মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	১২৭-১৩২
৯ম	বাংলাদেশের কর্মবিভাগ	১৩৩-১৪১
৯মক	জরুরী বিধানাবলী	১৪১ক-১৪১গ
১০ম	সংবিধান সংশোধন	১৪২
১১শ	বিবিধ	১৪৩-১৫৩

৪.২ সংবিধানে বাংলাদেশকে একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসেবে এবং জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি হিসেবে সংবিধানকে প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন। এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়নের অঙ্গীকার, মৌলিক অধিকারসমূহের সংরক্ষণ, স্বাধীন বিচার বিভাগ এবং স্বাধীন নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা।

৫.০ সংশোধনীসমূহ

বাংলাদেশের সংবিধানে এযাবৎকাল মোট তেরটি সংশোধনী আনা হয়েছে। এর ফলে সংবিধানের প্রস্তাবনা, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও সরকার পদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছে। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

ক. প্রথম সংশোধন ঃ ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই তারিখে সংবিধান (প্রথম সংশোধন) আইন ১৯৭৩ পাশ হয়। এটি ১৯৭৩ সালের ১৫ নম্বর আইন। এর দ্বারা

সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের ২ দফার পর নতুন ৩ দফা এবং ৪৭ক অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হয়। গণহত্যাজনিত অপরাধের বিচার করার উদ্দেশ্যে এই পরিবর্তন আনা হয়।

খ. দ্বিতীয় সংশোধন ঃ ১৯৭৩ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধন আইন পাশ হয়। এটি ১৯৭৩ সালের ২৪ নং আইন এর মাধ্যমে নবম ক ভাগ সংযোজন করা হয়। এছাড়া সংবিধানে ২৬, ৬৩, ৭২, ও ১৪২ অনুচ্ছেদ সংশোধন এবং ৩৩ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপন করা হয়। প্রয়োজনে জরুরি অবস্থা ঘোষণার আইনগত ভিত্তি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এই সংশোধন আনা হয়।

গ. তৃতীয় সংশোধন ঃ সংবিধান (তৃতীয় সংশোধন) আইন ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৭৪ নং আইন) পাশ হয় ১৯৭৪ সালের ২৭শে নভেম্বর। এই সংশোধনী দ্বারা সংবিধানের ২নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয়। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশের সীমানা পুনঃনির্ধারণের বিধান প্রণয়নই এ সংশোধনীর উদ্দেশ্য।

ঘ. চতুর্থ সংশোধন ঃ ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী সংবিধানের চতুর্থ সংশোধন আইন পাশ হয়। এটি ১৯৭৫ সালের ২ নম্বর আইন। বাংলাদেশের ইতিহাসে যে কোন বিবেচনাতেই চতুর্থ সংশোধন ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর ফলে সরকার পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসে। সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। রাষ্ট্রপতি পদে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিধান করা হয়। সংবিধানে নতুন ৬ষ্ঠ ক ভাগ সংযোজন করে একদলীয় ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়। মৌলিক অধিকার বলবৎকরণের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র আদালত প্রতিষ্ঠার বিধান করা হয় এবং বিচার কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পদোন্নতি, পদস্থাপন, ছুটি মঞ্জুর, সুপ্রীম কোর্টের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়। অবশ্য ১১৬ক অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বিচারকগণ স্বাধীন থাকবেন বলে ঘোষণা করা হয়।

ঙ. পঞ্চম সংশোধন ঃ ১৯৭৯ সালের ৬ই এপ্রিল সংবিধানের পঞ্চম সংশোধন আইন পাশ হয়। এটি ১৯৭৯ সালের ১নং আইন। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট বাংলাদেশে সামরিক শাসন জারী করা হয়। ১৯৭৯ সালের ৯ই এপ্রিল তা প্রত্যাহৃত হয়। সামরিক শাসন জারীর পর রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফরমান/আদেশ ইত্যাদি জারী করা হয়। এ সময়ে সংবিধানেও সংশোধনী আনা হয়। উল্লেখিত ফরমানসমূহ এবং সংবিধানের সংশোধনীসমূহ পঞ্চম সংশোধন দ্বারা অনুমোদিত হয়। এর ফলে সংবিধানের প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সংযোজিত হয়। এছাড়া বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী হিসেবে পরিচিত হবেন বলে ঘোষণা করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসকে অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। অপর মূলনীতি সমাজতন্ত্রকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার অর্থে গ্রহণ করা হয়। মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎকরণের এখতিয়ার হাইকোর্ট বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। একদলীয় ব্যবস্থা রহিত করা হয়। তবে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার পদ্ধতি বহাল রাখা হয়। উপরন্তু রাষ্ট্রপতির এখতিয়ার সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহের সংশোধন ব্যবস্থা

অধিকতর জটিল করা হয়। এছাড়া এই সংশোধনীর মাধ্যমে বিচার কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মস্থল নির্ধারণ ও পদোন্নতি সুপ্রীম কোর্টের হাতে ন্যস্ত করা হয়।

চ. ষষ্ঠ সংশোধন ঃ সংবিধানে ষষ্ঠ সংশোধন আইন পাশ হয় ১৯৮১ সালের ৯ই জুলাই তারিখে। এটি ১৯৮১ সালের ১৪নং আইন। এর মাধ্যমে সংবিধানের ৫১ ও ৬৬ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির পদ দু'টো লাভজনক পদ হিসেবে গণ্য হবে না বলে ঘোষণা করা। তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতির রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যেই এই সংশোধন আনা হয়।

ছ. সপ্তম সংশোধন ঃ ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর সংবিধানের সপ্তম সংশোধন আইন পাশ হয়। এটি ১৯৮৬ সালের ১ নং আইন। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ তারিখে বাংলাদেশে দ্বিতীয়বার সামরিক শাসন জারি হয়। ১৯৮৬ সালের ১০ই নভেম্বর তা প্রত্যাহার করা হয়। এ সময় রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য বিভিন্ন প্রকার ফরমান/আদেশ ইত্যাদি জারী করা হয়। আলোচ্য সংশোধনীতে উল্লিখিত ফরমান/আদেশ ইত্যাদি অনুমোদন করা হয়। এছাড়া এই সংশোধনীর মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের চাকরির মেয়াদ বাষট্টি বছর থেকে বাড়িয়ে পয়ষট্টি বছর করা হয়।

জ. অষ্টম সংশোধন ঃ ১৯৮৮ সালের ৭ই জুন তারিখে সংবিধানের অষ্টম সংশোধন আইন গৃহীত হয়। এর মাধ্যমে সংবিধানে ২ক অনুচ্ছেদ সংযোজন করে ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়, তবে অন্যান্য ধর্মও শান্তিতে পালন করা যাবে বলে উল্লেখ করা হয়। এ সংশোধনীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল হাইকোর্টের বিকেন্দ্রিকরণ। সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করে কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, যশোর, রংপুর ও সিলেটে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার বিধান করা হয়। এছাড়া এ সংশোধনী দ্বারা সংবিধানের ইংরেজী-লিপির ৩ অনুচ্ছেদে Bengali শব্দের স্থলে Bangla এবং ৫ অনুচ্ছেদে Dacca এর স্থলে Dhaka শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৮৯ সালের ২রা সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ অষ্টম সংশোধন আইনের হাইকোর্ট বিভাগ বিকেন্দ্রিকরণ সংক্রান্ত অংশটি সংবিধান বহির্ভূত, অকার্যকর ও বাতিল বলে ঘোষণা করেন।

ঝ. নবম সংশোধন ঃ ১৯৮৯ সালের ১০ই জুলাই তারিখে সংবিধানের নবম সংশোধন আইন গৃহীত হয়। এটি ১৯৮৯ সালের ৩৮ নং আইন। এই সংশোধনীর মাধ্যমে উপরাষ্ট্রপতি পদে রাষ্ট্রপতি পদের ন্যায় সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া রাষ্টপতি বা উপরাষ্ট্রপতি একাধিক্রমে দু'মেয়াদের বেশি রাষ্ট্রপতি কিংবা উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারবেন না বলে ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৯ সালের ১ অক্টোবর তারিখ থেকে এ সংশোধন কার্যকর করা হয়।

ঞ. দশম সংশোধন ঃ ১৯৯০ সালের ২০ই জুন তারিখে সংবিধানের দশম সংশোধন আইন পাশ হয়। এটি ১৯৯০ সালের ৩৮নং আইন। এর মাধ্যমে সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের ৩ দফা প্রতিস্থাপন করে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ ১০ বছর বাড়ানো হয়।

ট. একাদশ সংশোধন ঃ ১৯৯১ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে সংবিধানের একাদশ সংশোধন আইন পাশ হয়। এটি ১৯৯১ সালের ২৪নং আইন। এর মাধ্যমে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ, দায়িত্ব পালন এবং তাঁর প্রধান বিচারপতি পদে প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি অনুমোদিত হয়।

ঠ. দ্বাদশ সংশোধন ঃ ১৯৯১ সালের ৬ই আগষ্ট জাতীয় সংসদে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধন আইন গৃহীত হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে যুগান্তকারী এই সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির পরিবর্তে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ আইন গ্রহণের ব্যাপারে সরকারি এবং বিরোধী দলীয় সংসদ-সদস্যগণ অভূতপূর্ব ঐক্যমত্য প্রদর্শন করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, সংবিধানের ৫ম সংশোধন আইনে এরূপ বিধান ছিলো যে, সংবিধানের প্রারম্ভ, প্রস্তাবনা, ও রাষ্ট্রপতির এখতিয়ার সংক্রান্ত কোন অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হলে রাষ্ট্রপতি তাতে স্বাক্ষরদানের পূর্বে গণভোটের আয়োজন করবেন। উক্ত বিধান অনুযায়ী ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯১ তারিখে দ্বাদশ সংশোধনীর ওপরে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটে দ্বাদশ সংশোধনী অনুমোদিত হয়।*

৬.০ সরকার-পদ্ধতির বিবর্তন

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে রাষ্ট্রপতির হাতে সকল নির্বাহী কর্তৃত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি বিবেচনা করেই তা করা হয়েছিল। এটি ছিল নিঃসন্দেহে একটি রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার। পরবর্তীকালে অস্থায়ী সংবিধান আদেশের মাধ্যমে এ অবস্থার পরিবর্তন করা হয়। এতে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে দায়িত্ব পালন করবেন বলে উল্লেখ করা হয়। এটিকে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের সবুজ-সংকেত হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধানে যে সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, তাতে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকবে, রাষ্ট্রপতি যে সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন, মন্ত্রিপরিষদ সংসদের নিকট দায়ী থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়। এ ব্যবস্থাকে আদর্শ সংসদীয় পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে চতুর্থ সংশোধন আইন দ্বারা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয়। এই পর্যায়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট সামরিক শাসন জারী করা হয়। ১৯৭৯ সালের ৬ই এপ্রিল পর্যন্ত তা বলবৎ থাকে। সামরিক শাসন চলাকালে ১৯৭৮ সালে দ্বিতীয় ফরমান (পঞ্চদশ সংশোধন) আদেশ জারি করা হয়। এর দ্বারা সংবিধানে বেশকিছু পরিবর্তন আনা হয়, যা ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ পরিবর্তনগুলো সংবিধানের পঞ্চম সংশোধন আইনে অনুমোদিত হয়। এতে চতুর্থ সংশোধন আইনের অনেকগুলো বিধান রদ করা হলেও রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা চালু রাখা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮২ সালের ২৪ শে মার্চ দ্বিতীয় বার সামরিক শাসন জারী করা হয়। ১৯৮৬ সালের ১০ই নভেম্বর সামরিক শাসন প্রত্যাহৃত হলেও রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা বলবৎ থাকে। এ অবস্থা চলতে থাকে ১৯৯১ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ১৯৯১

---

* এই লেখা ছাপাখানায় যাওয়ার পর সংবিধানের এয়োদশ সংশোধন আইন ১৯৯৬ পাশ হয় তাই এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হলো না।

সালের ৬ই আগষ্ট জাতীয় সংসদে দ্বাদশ সংশোধন আইন গৃহীত হয় এবং ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত গণভোটে তা অনুমোদিত হয়। এর মাধ্যমে সংসদীয় পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

উপসংহার

সংবিধান একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। এটিকে পবিত্র দলিল হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ক্ষেত্রে একথা আরো বিশেষভাবে প্রযোজ্য, কারণ নিযুত-প্রাণের বিনিময়ে এদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। আর সংবিধান হচ্ছে স্বাধীনতার অন্যতম ফসল। বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ, আর জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি হিসেবে সংবিধান হচ্ছে প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন। তবে একথা বলা প্রয়োজন যে, কালের প্রবাহের সাথে সাথে রাষ্ট্রের কাজের ধরন বদলে যায় এবং রাষ্ট্রের কাছে নাগরিকদের প্রত্যাশারও পরিবর্তন ঘটে। তাই পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রতিটি সংবিধানেই সংশোধনের ব্যবস্থা থাকে। বাংলাদেশের সংবিধান এ যাবৎ তের বার সংশোধিত হয়েছে। এই সংশোধনীগুলো কতটা প্রাসঙ্গিক ছিল তা অবশ্যই আলোচনার দাবি রাখে। তবে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী জনগণের দ্বারা বিপুলভাবে অভিনন্দিত হওয়ার বিষয়টি অবশ্যই লক্ষ্যণীয়। এর দ্বারা সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৭২ সালে যেখান থেকে শুরু হয়েছিল ১৯৯১ সালে আবার সেখান থেকেই নতুন করে যাত্রা শুরু হয়েছে। সুতরাং প্রকৃত অর্থে সাংবিধানিক শাসনের বিকাশ ঘটেছে এমনটি বলা যাবে না। তবে যাত্রা শুরু হয়েছে, এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে। এই প্রত্যাশার তাৎপর্য অপরিসীম।

বি ঃ দ্র ঃ প্রবন্ধটি বিপিএটিসির বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের বাংলাদেশ চর্চা মডিউলের পাঠ্যবিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারঃ *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ (দলিলপত্র তৃতীয় খন্ড)*, পৃঃ ৪ ও ৭।

২। নাথ, বিপুল রঞ্জনঃ ১৯৮২, *বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক দলিল*, বুক সোসাইটি, ঢাকা, পৃঃ ৫০-৫১

৩। আহমেদ, মওদুদঃ ১৯৮৩ *বাংলাদেশঃ শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল;* ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, পৃঃ ১১৮-১১৯ ও ১৩৫।

৪। রহমান, গাজী শামছুরঃ *বাংলাদেশের সংবিধানের ভাষ্য;* পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা, ১১৮৫-১২৪৬।

৫। দৈনিক ইত্তেফাক, ৩রা জুলাই ১৯৯১, এবং ৭ ও ৮ আগষ্ট ১৯৯১।

৬। দৈনিক সংবাদ ২রা জুলাই, ১৯৯১।

৭। Bangladesh Observer, 16 August, 1991